সংবাদ

তারিখ 04 JAN 2016
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রতিবছর বাড়ছে বাজেট

কমছে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি

রাকিব উদ্দিন

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিও খাতে প্রতিবছর সরকারের বাজেট বরাদ্দ বাড়ছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা সরকার থেকে শতভাগ বেতন ভাতা, বাড়ি ভাড়া ও উৎসব ভাতাও পাচ্ছেন। কিন্তু এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করতে পারছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পরিচালনা করছেন। তারা ইচ্ছেমতো শাখা ও ক্যাম্পাস খুলে শিক্ষা বাণিজ্য করছেন। ফলে সরকারি অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহারের পাশাপাশি বাড়ছে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও নিয়োগ বাণিজ্য। এমপিও খাতে প্রতি মাসে সরকারের প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে কিন্তু আশানুরূপ ফল পাচ্ছে না সরকার। এসব নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোন আইনও নেই। নেই সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। বিভিন্ন সময়ে জারি করা কিছু বিধিমালার আলোকেই চলছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এ বিষয়ে শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন কমিটির সদস্য প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবির সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষানীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বেসরকারি প্রতিষ্ঠাম দিয়ে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের অডিট করানো। আয়-ব্যয় কোথায় যাচ্ছে, তার হিসাব নেই। পরিচালনা পরিষদে যারা আছেন, তাদেরও জবাবদিহিতা নেই। দু'একটি ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা অডিটে গেলেও টাকা-পয়সা নিয়ে চলে আসে।'

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'নীতিমালা ও আইন ছাড় শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে পারে না। তা না করে সরকার যখন খুশি একটি

এমপিওভুক্ত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

এমপিওভুক্ত : শিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিধিমালা ও পরিপত্র জারি করে প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। অথচ পাঁচ বছরেও শিক্ষা আইন করতে পারল না। আইন না থাকলে অব্যবস্থাপনা চলতেই থাকবে।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গত ২২ ডিসেম্বর সচিবালয়ে মিডিয়া সেন্টারে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে জানান, এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় নজরদারির আওতায় আনার কাজ চলছে। এ বিষয়ে একটি আইন করার কাজ চলছে। প্রয়োজনে শিক্ষা আইনের কোন ধারায়ও এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।'

বর্তমানে দেশে প্রায় ২৮ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এরমধ্যে স্কুল ১৬ হাজার ১১৮টি, কলেজ দুই হাজার ৩৭০টি, মাদ্রাসা প্রায় আট হাজার এবং কারিগরি প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৭৭৫টি। এছাড়াও কিছু মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো সরকার থেকে এমপিও সুবিধা পাচ্ছে। সর্বমিলিয়ে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন। বর্তমানে তাদের এমপিও বাবদ প্রতি মাসে সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় পাঁচশ কোটি টাকা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নথি থেকে জানা গেছে, ১৯৮৪ সালে মাউশি অধিদফতরের বাজেট ছিল ২৩৫ কোটি টাকার, ২০০৯ সালে যা ছিল প্রায় চার হাজার কোটি টাকার। বর্তমানে মাউশির বাজেট হচ্ছে প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতিবছরই এমপিও খাতের বরাদ্দ বাড়ছে।

এ বিষয়ে প্রবীণ শিক্ষক নেতা প্রফেসর মাজহারুল হান্নান সংবাদকে বলেন, 'সরকার এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ১০০ ভাগ বেতন দিচ্ছে। দিচ্ছে অন্যান্য ভাতাও। কিন্তু প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করছে স্থানীয় লোকজন অর্থাৎ গভর্নিং বডি, যাদের পাঁচ ভাগের বেশি গভর্নিং বডিতে থাকার যোগ্য নয়।' তিনি বলেন, 'প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতার জন্যই সরকারের উচিত এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসেব নেয়া।'

তদারকির সক্ষমতা বাড়েনি, বেড়েছে ব্যয়

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিও (মান্থলি পে অর্ডার বা বেতনের সরকারি অংশ) দেয়ার কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৯ সালে। এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতা প্রদান সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম মাউশি অধিদফতরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানা অনিয়ম ও অভিযোগ খতিয়ে দেখতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্বায়ত্বশাসিত 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর' (ডিআইএ) রয়েছে।

প্রতি বছর এমপিও খাতে বরাদ্দ বা ব্যয় বাড়ার পাশাপাশি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদনও পাচ্ছে। আবার শিক্ষার্থী বৃদ্ধি সংক্রান্ত কারণে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন বা শ্রেণি কার্যক্রমের পরিধিও বাড়ছে।

কিন্তু প্রতিষ্ঠাকালীন সময় মাউশি অধিদফতর ও ডিআইএ'র যে জনবল ছিল, বর্তমানেও একই জনবল রয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য জনবল নিয়োগে নতুন পদ সৃষ্টি হয়নি; উল্টো বেড়েছে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য সরকারের ব্যয়।

এছাড়াও শিক্ষা বোর্ডগুলো ক্ষেত্র বিশেষ দু'একটি প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম তদন্ত করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক স্বীকৃতি, পাঠদান অনুমোদন ও নবায়ন এবং নতুন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার অনুমোদন প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণ নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে।

১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় ডিআইএ। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে একজন পরিচালক, একজন যুগ্ম পরিচালক, চারজন উপ-পরিচালক, ১২ জন শিক্ষা পরিদর্শক, ১২ জন সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক, ১২ জন অডিটর, চারজন অডিট অফিসারের পদ ছিল। বর্তমানে একই পদ রয়েছে। অর্থাৎ গত ২৫ বছরে ওই সংস্থায় কোন পদ সৃষ্টি হয়নি।

ডিআইএ'র উপ-পরিচালক রাশেদুজ্জামান জানান, 'বিগত ২৫ বছরে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কয়েক গুণ বাড়লেও আমাদের জনবল বাড়েনি। কাজের চাপ বেড়েছে বহুগুণ। এরপরও চাপের মধ্যে থেকে বছরে এক হাজার থেকে দেড় হাজার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিদর্শন করছে ডিআইএ।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের কাছে কেবল ১৯৬১ সালে ঢাকা জেলা প্রশাসনের জারি করা একটি আদেশ রয়েছে। যেটি জারির সময় কোন প্রতিষ্ঠানই সরকারের অর্থে পরিচালিত হতো না। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষক-কর্মচারীর শতভাগ বেতন সরকারিভাবে দেয়া হচ্ছে। ফলে সেই নীতিমালা স্বাভাবিক কারণেই অকার্যকর হয়ে আছে, যা কার্যকর করতে পারছে না শিক্ষা প্রশাসন।

এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশীদ সংবাদকে বলেন, 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ভালো কোন নীতিমালা নেই। নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন খুবই ভয়ঙ্কর বিষয়। কারণ বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ বা গভর্নিং বডির ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। তবে প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম বন্ধ করা এবং মানসম্মত শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে একটি গ্রহণযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা জরুরি।'

অনুমোদন ছাড়াই শাখা ক্যাম্পাস

রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলার সুনাম অর্জনকারী অনেক স্কুল অ্যান্ড কলেজ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন না নিয়েই শাখা ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। সরকারি নিয়ম বা নীতিমালার তোয়াক্কা করছে না এসব প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি। অথচ এসব প্রতিষ্ঠান সরকার থেকে নিয়মিত এমপিও সুবিধা পাচ্ছে। রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মণিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বাণিজ্যনির্ভর ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ বিপুলসংখ্যক প্রতিষ্ঠান অনুমোদনহীন শাখা ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে।

শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলছেন, 'শাখা খোলার বিষয়ে কোন নীতিমালা ও আইন নেই। শাখা খোলা যাবে কি না সে সম্পর্কে পরিপত্রও নেই। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এগুলোর বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থাও নিতে পারছে না। সব মিলিয়ে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গভর্নিং বডির স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারে শিক্ষকরা উদ্বিগ্ন।'

এডহক কমিটি ও গভর্নিং বডির নিয়োগ ক্ষমতা বাতিল

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত, অনিয়ম-দুর্নীতির লাগাম টানা ও নিয়োগ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে ইতোমধ্যেই পরিপত্র জারি করে এডহক (আহ্বায়ক) ভিত্তিতে গঠিত গভর্নিং বডির শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ ক্ষমতা বিলুপ্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অভিযোগ ছিল, মাত্র ৬ মাস এডহক কমিটির মেয়াদ থাকলেও স্থানীয় প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধিদের অবৈধ ক্ষমতা ও নিয়োগ বাণিজ্যের লোভে ক্ষেত্রবিশেষ দশ বছর ধরে চলেছে অনেক নামিদামি স্কুল ও কলেজ।

এডহক কমিটির নিয়োগ বাতিল করেও নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ করতে না পারায় সম্প্রতি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গভর্নিং বডির মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রমই বন্ধ ঘোষণা করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে, ...ষর নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ করলেও অন্যান্য অনিয়ম থেমে নেই।